রাজা শিয়ালাগানের গ্রামে

মনে-প্রাণে ভ্রামণিক, মাঝে-মাঝে বেড়ানোর সুযোগও মেলে, কিন্তু ভ্রমণের আনন্দ থেকে ক্রমশ বঞ্চিত, এমন হতভাগ্য কাউকে জানেন কি? সে আমি। আজকাল যেখানেই যাই, ঝটিকাসফরে। নামলাম, ছবি তুললাম, ফিরে এলাম। না হল দেশটাকে সময় নিয়ে দেখা, না হল সেখানকার জীবনকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা। সীমিত সময়ে, নির্দিষ্ট এলাকায় যথাসাধ্য ক্যামেরা ঘুরিয়ে ভ্রমণের আশা ভরসা, স্বপ্ন সাধ জলাঞ্জলি দিয়ে বিষণ্ন মনে ফিরে আসার দুঃখ দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি কখনও। সান্ত্বনা একটাই, এভাবে না হলে এত সব আশ্চর্য দেশ-দেশান্তর দেখা হত কি?

যেমন, এবছর আগস্টের শেষ সপ্তাহে। ঠিক হল ইন্দোনেশিয়ার তিন দ্বীপ বালি-জাভা-সুমাত্রা ঘুরে একটা ভ্রমণচিত্র তৈরি করতে হবে। সময় মাত্র দু'সপ্তাহ। কেন এমন শিরে সংক্রান্তি? কারণ একটাই— অফিসের কাজ আর দূরদর্শনের তারিখ অমান্য করার উপায় নেই।

কলকাতায় বসে সমুদ্রের বুকে ছড়ানো- ছেটানো অসংখ্য দ্বীপের সমষ্টি ইন্দোনেশিয়ার প্রধান তিনটি দ্বীপ বেছে নিলেও সমস্যা হল কোনদিক থেকে শুরু করব— যাতে সময় বাঁচে, যাত্রাকালেরও কিছুটা সাশ্রয় হয়?

অনেক কাটাকুটির পর কলকাতা থেকে সিঙ্গাপুর ছুঁয়ে সোজা গিয়ে নামলাম উত্তর সুমাত্রার মেদানে।

ইন্দোনেশিয়া ভূকম্পপ্রবণ দেশ। সুমাত্রায়ও সে ভয় মাত্রাছাড়া। সেই সুমাত্রা দিয়েই আমরা শুরু করলাম। দু'সপ্তাহ ধরে সুমাত্রা-জাভা-বালি ও সবশেষে লম্বক দ্বীপ ঘুরে কলকাতায় ফিরেই টিভির খবরে দেখলাম সুমাত্রা আর জাকার্তায় প্রবল ভূমিকম্প হচ্ছে। তখনই জানলাম ভূমিকম্পের ভয়েই নাকি আমার সহকারীটি যাত্রার আগে উইল করে গিয়েছিলেন।

মেদান উত্তর সুমাত্রার রাজধানী, ইন্দোনেশিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম শহর। এই দ্বীপপুঞ্জের দেশে আর পাঁচটা ব্যস্ত শহরের মতো, মেদানের রাস্তাতেও গাড়িঘোড়া, মানুষজনের ভিড়। মনকে বিশেষভাবে টানে তেমন কিছুরও এখানে খোঁজ পেলাম না। তাই এয়ারপোর্ট থেকে সোজা পাড়ি দিলাম পাহাড়ের ওপর ছোট্ট হিলটাউন ব্রাস্তাগিতে।

শহরের ভিড়ভাট্টা কাটিয়ে পথ ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। আমাদের গাড়িও পাহাড়ি রাস্তা ধরল। পাল্টে গেল পথের দুদিকের দৃশ্যপট। সতেজ সবুজের মধ্য দিয়ে কালো পিচের রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে গেছে।

ইন্দোনেশিয়া নিয়ে ছবি তুলতে এসেছি জেনে, আমাদের ড্রাইভার-কাম-গাইড দ্বিগুণ উৎসাহে তাঁর দেশের কথা সগর্বে আমাদের বলতে শুরু করলেন। আমি এক ফাঁকে তাঁকে ইন্দোনেশিয়ার অতি জনপ্রিয় ফল 'দুরিয়ান'-এর কথা জিজ্ঞেস করলাম। থাইল্যান্ডেও দুরিয়ানের খুব আদর দেখেছি। সেই থেকেই এ-ফল চেখে দেখার খুব ইচ্ছে। সেকথা গাইডকে জানাতে তিনি কথা দিলেন, ব্রাস্তাগি যাবার পথে দুরিয়ানের জন্য বিখ্যাত একটা গ্রাম পড়বে। সেখানে অবশ্যই গাড়ি থামাবেন। সেইসঙ্গে তাঁর সতর্কবাণী—দুরিয়ানের স্বাদ যতটা স্বর্গীয়, তার গন্ধ ততটাই নারকীয়। কথাটার সম্পূর্ণ অর্থ উদ্ধার হল সেই দুরিয়ানখ্যাত গ্রামে পৌঁছে। যে ফলের উগ্র গন্ধে ফল চেখে দেখার নিবিড় বাসনা কর্পূরের মতো উবে গেল। শুধু ফলের ছবি তুলেই দুরিয়ান-পর্বের ইতি ঘটল।

পাহাড়ের বেশ অনেকটা উঁচুতে উঠে একটা জায়গায় আমাদের গাইড গাড়ি থামালেন। বললেন, এটা পুঞ্চা ভিউপয়েন্ট। স্থানীয় ভাষায় পুঞ্চা মানে টপ অব দ্য টপ। গাড়ি থেকে নামতেই বেশ ঠান্ডা লাগল। সঙ্গে টিপটিপ বৃষ্টি। বৃষ্টি থেকে ক্যামেরা বাঁচিয়ে টিনের ছাউনির তলায় রেলিংয়ের ধারে এগিয়ে গেলাম। এত অল্প সময়ে আমরা যে এতটা ওপরে উঠে এসেছি রেলিংয়ের ওপারের উপত্যকা দেখে তবে বুঝতে পারলাম। অনেক নীচে 'বান্ডারবারু' বা 'নতুন শহর', তারও দূরে মেদান। আড়াই-তিনঘণ্টায় পাহাড়ি রাস্তা পেরিয়ে দুপুর একটা নাগাদ ব্রাস্তাগি পৌঁছলাম।

ব্রাস্তাগি অনেককালের পুরনো পাহাড়ি শহর। উচ্চতায় দেড়হাজার ফুট। এ যেন সুমাত্রার মধ্যেই ছোট্ট একটা আলাদা রাজ্য। এখানকার বেশিরভাগ বাসিন্দাই এ অঞ্চলের আদি বাসিন্দা। সবাই বাতাক সম্প্রদায়ের মানুষ।

ইংরিজিভাষী গাইড নামে খ্রিস্টান, ধর্মে মুসলমান। তিনি গোড়াতেই বাতাকদের স্বভাবের পরিচয় দিয়ে বললেন, এরা অচেনা মানুষদের কাছে গলা তুলে রাগি মেজাজে কথা বলতে ভালোবাসে। ফলে তেমন কোনও পরিস্থিতিতে আমরা যেন তর্ক না করে বক্তার সঙ্গে সহমত হই, সম্ভব হলে নিরুত্তর থাকি। বিদেশিদের প্রতি এরকম ভালোবাসার কথা শুনে প্রথমে একটু দমে গেলেও, পরে দেখলাম ভয়ের কিছু নেই।

ব্রাস্তাগিতে লোকে যায় গুস্তালিং পাহাড়চূড়ায় সিনাবুং আর সেবায়াক নামের দুটি আগ্নেয়গিরি দেখতে।

হোটেলে চেক-ইন করে, চটপট দুপুরের খাওয়া সেরে আমরাও তাই বেরিয়ে পড়লাম এই দুটি আগ্নেয়গিরি দেখতে। ছবি তোলার তাড়ায় মধ্যাহ্নভোজনে পরিবেশিত গরম ইন্দোনেশীয় চালের ভাত আর অতি সুস্বাদু সবজির তরকারি 'গাদো-গাদো' আয়েশ করে আর খাওয়া হল না।

আমাদের গাড়ি ক্রমশ আরও উঁচুতে উঠতে থাকল। এ রাস্তা গেছে গুস্তালিং পাহাড়চূড়ায়। গুস্তালিং ব্রাস্তাগির সবচেয়ে উঁচু জায়গা। সরু পিচের রাস্তার একদিকে উঠে গেছে খাড়া পাহাড় আর অন্যদিকে খাদ। নীচে দেখা যাচ্ছে ব্রাস্তাগি টাউন। পড়ন্ত দুপুরের আলোয় প্রকৃতি যেন আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে। স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস, সেবায়াক আগ্নেয়গিরির অন্দরে বাস করেন এক রাজকুমারী, নাম তার বেরু পাতিমার। গুস্তালিং ভিউপয়েন্টে, সেবায়াক আগ্নেয়গিরির দিকে সেই রাজকুমারীর মূর্তি রয়েছে। মূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে কোনও পুরুষ যদি মনের মতো বান্ধবী কামনা করেন, তা নাকি পূরণ হয়। ঠিক একইভাবে সিনাবুং আগ্নেয়গিরির ভেতর বাস করেন এক রাজকুমার। সেই রাজপুত্রের মূর্তি সিনাবুং আগ্নেয়গিরির সামনে। কোনও মেয়ে যদি সে মূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে তার স্বপ্নের মানুষকে কামনা করে, তাও নাকি পূরণ হয়। তবে রাজকুমারীই বলুন আর রাজপুত্রই বলুন, মূর্তি দুটি দেখে হতাশই হতে হয়।

সেবায়াক আগ্নেয়গিরির কোলে উষ্ণপ্রস্রবণ। আগ্নেয়গিরি দেখে এখন যাব সেখানে। ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম 'রাজা রুনহা'-র। গ্রামের মেঠোপথ দিয়ে চলেছি সেই প্রস্রবণের দিকে। বিকেলের পড়ন্ত আলোয় দেখতে পেলাম আগ্নেয়গিরির মুখ দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। তার অনেকটা নীচে, দু-তিন জায়গা থেকে সাদা ধোঁয়া পাক খেয়ে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। গাইড বললেন, এ হল প্রস্রবণের গরম জল থেকে উঠে আসা বাষ্প। সন্ধের আবছায়ায়, দৈত্যের মতো বিশাল আগ্নেয়গিরির পাদদেশে দাঁড়িয়ে, তার মুখ দিয়ে গলগল করে বেরিয়ে আসা সাদা ধোঁয়ার মধ্যে থেকে যেন এক গুপ্ত দানব জেগে উঠছে। অনর্গল বলশালী ধোঁয়ার পাকে পাকে মনে হয় যেন এক অজানা আশঙ্কা জড়িয়ে রয়েছে। আমাদের গাইড অভয় দেন, ভয়ের কিছু নেই। জীবিত আগ্নেয়গিরি হলেও, উদ্‌গীরণের বেশ কিছুদিন আগে তা টের পাওয়া যায়। তাই আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে আগ্নেয়গিরির দিকে এগিয়ে যেতে পারি। প্রায় সন্ধের মুখে পৌঁছলাম উষ্ণপ্রস্রবণে।

স্থানীয় মানুষজন আর কাছে-দূরের পর্যটকের দল ভিড় করে এসেছেন আগ্নেয়গিরির আরোগ্যদায়ী উষ্ণপ্রস্রবণে অবগাহন করতে।

আমি শুধু ক্যামেরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়েই ঘুরে বেড়ালাম। এমনকি যখন ব্রাস্তাগি ছেড়ে যাচ্ছি, তখনও মাঠ মসজিদ, গম্বুজ গির্জা, দোকানবাজার রাস্তার ছবি তুলতেই ব্যস্ত। দুচোখ ক্যামেরায়, কলুর চোখ-বাঁধা বলদের মতো।

ভবিষ্যতে যদি কখনও আবার সুমাত্রা আসি, তাহলে ব্রাস্তাগিতে অতি অবশ্য কয়েকটা দিন চুপ করে বসে থাকব। আগ্নেয়গিরি, উষ্ণপ্রস্রবণ ইত্যাদি দেখব নিশ্চয়ই, তবে ধীর লয়ে। একদিনে একদিকের বেশি নয়। ব্রাস্তাগিতে সবাই শুধু দেখতেই আসে। দুদিন থাকবার কথা কেউ ভাবে না দেখে দুঃখ হয়। আমি ভেবেও থাকতে পারলাম না, সে আরও দুঃখের।

ব্রাস্তাগি থেকে এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে পথ গিয়েছে তোবা হ্রদের তীরে। ব্রাস্তাগি, তোবা লেক— দুই অঞ্চলের অধিবাসীরাই বাতাক উপজাতির মানুষ। ব্রাস্তাগির লোকেরা বাতাককারু সম্প্রদায়ের আর তোবা লেকের অধিবাসীরা বাতাকতোবা সম্প্রদায়ের।

তোবা সরোবর যাবার পথে, একেবারে রাস্তার ওপরেই গাছভরা কমলা। লেবুর রঙে প্রায় রং মিলিয়ে সূর্যমুখীর জঙ্গল। আরেকটু এগিয়ে একটা গ্রাম, নাম লিঙ্গাডোকান। এ হল বাতাকদের গ্রাম। বাড়িগুলো তাদের সাবেকি রীতির স্থাপত্যে গড়া।